ফয়যানে মদীনা

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা



- কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা (পর্ব: ০১)
- গোড়ালির আঘাতে ঝর্ণা প্রবাহিত হলো
- হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা رضی اللہ عنہ
- ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যবস্থাপনা
- মেয়েদের মেহমানদারির আদব শেখান

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

ফয়যানে মদীনা

জানুয়ারী ২০১৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী



মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন



(পর্ব: ০১)

কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা

মাওলানা রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

কুরআনুল করীম আল্লাহ পাকের সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি কেবল একটি কিতাব নয়, বরং মানবজাতির জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, হেদায়েতের উৎস এবং রহমতের বার্তা। আল্লাহ পাক কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে এই মহান কিতাব অবতীর্ণের হিকমত, উদ্দেশ্য এবং কারণসমূহ বর্ণনা করেছেন। কোথাও "نزّل" এবং "اَنزل" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোথাও "آتينا" এবং অন্যান্য দানবাচক শব্দ সহকারে এই উদ্দেশ্যগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলো এতটাই ব্যাপক এবং সর্বজনীন যে, তা মানবজীবনের প্রতিটি দিককে বেষ্টন করে রয়েছে। নিচে আমি কুরআনুল করীমের আলোকে এই উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞাগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা তুলে ধরছি:

হেদায়েত এবং সঠিক পথের দিকে দিকনির্দেশনা

কুরআন অবতীর্ণের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনুল করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে, এই কিতাব মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সে-ই সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (কুরআন) যাতে কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নেই; তাতে হেদায়েত রয়েছে খোদাভীতি সম্পন্নদের জন্য। (পারা:১, সূরা বাকারা: ২)

অনুরূপভাবে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক রমযান মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ রমযানের মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হেদায়েত ও পথ নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। (পারা:২, সূরা বাকারা: ১৮৫)

সূরা ইউনুসে আরও ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ(۵۷)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে মানবকুল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হেদায়েত এবং রহমত ঈমানদারদের জন্য। (পারা: ১১, সূরা ইউনুস: ৫৭)

এই আয়াতে করীমাগুলো স্পষ্ট করে যে, কুরআনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়েতের আলোকবর্তিকার দিকে নিয়ে আসা। মানুষ তার স্বভাবজাতভাবে সত্যের সন্ধানী, কিন্তু শয়তানি কুমন্ত্রণা, নফসের কুপ্রবৃত্তি এবং পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। কুরআন হলো সেই হেদায়েতের নূর, যা প্রতিটি যুগে, প্রতিটি সমাজে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য মুক্তির পথ নির্ধারণ করে। কুরআনুল করীম মানুষকে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পথপ্রদর্শন করে। সমাজে যখন মানুষ কুরআনের হেদায়েত থেকে দূরে সরে যায়, তখন বিশৃঙ্খলা, বিপথগামিতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম নেয়। কিন্তু যখন কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তখন সমাজ শান্তি, প্রশান্তি এবং উন্নতির পথে ধাবিত হয়।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য এবং ফয়সালা

কুরআন অবতীর্ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে যে, এই কিতাব সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী এবং চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। আল্লাহ পাক সূরা ফুরকানে ইরশাদ করেন:

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرَاۙ(۱)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি অবতীর্ণ করেছেন কুরআন আপন বান্দার প্রতি, যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন। (পারা:১৮, সূরা ফুরকান: ১)

অনুরূপভাবে সূরা আলে-ইমরানে ইরশাদ করেন:

نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ(۳) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ তিনি আপনার উপর এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবাদির সমর্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন মানবজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; এবং ফয়সালা অবতারণ করেছেন।

(পারা:৩, সূরা আলে-ইমরান: ৩-৪)

কুরআনে করীম এর নাম "আল-ফুরকান" এই কারণেই দেওয়া হয়েছে যে, এটি প্রতিটি বিষয়ে সত্য ও মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়। এটি কেবল আকিদায় নয়, বরং নৈতিকতা, সামাজিক লেনদেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক বিষয় এবং জীবনের প্রতিটি শাখায় সঠিক ও ভুলের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। বর্তমান বিশ্বে যেখানে আপেক্ষিকতাবাদের (**Relativism**) প্রাধান্য রয়েছে, সেখানে কুরআন সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত মানদণ্ড প্রদান করে। এটি মানুষকে অন্ধকারে পথহারা হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং তাকে বিশ্বাসের পথ দেখায়। সমাজে যখন এই ভালো-মন্দের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন নৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে যায়; কিন্তু কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করে সমাজ একটি সুস্পষ্ট নৈতিক কাঠামোর অধিকারী হয়।

মুমিনদের জন্য সুসংবাদ

কুরআন অবতীর্ণের একটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে যে, এই কিতাব ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ। সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ
وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ
اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِیْرًا ۙ﴿۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় এ কুরআন ঐ পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সোজা এবং সুসংবাদ দেয় ঐ ঈমানদারদেরকে, যারা সৎকর্ম করে যে, 'তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।'

(পারা: ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল: ৯)

সূরা নাহলেও একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে:

وَ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَّ هُدًى
وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِیْنَ ﴿۸۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি আপনার উপর এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ, পথ নির্দেশনা, দয়া ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।

(পারা: ১৪, সূরা নাহল: ৮৯)

এই আয়াতগুলো বলে যে, কুরআন কেবল ভয় দেখানোর জন্য নয়, বরং ঈমানদারদের আশা জাগাতে এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টির জন্যও অবতীর্ণ হয়েছে। মুমিন যখন কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর বিধানাবলী মেনে চলে, তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাতের নেয়ামত এবং চিরস্থায়ী সফলতার সুসংবাদ পায়। এই সুসংবাদগুলো মানুষের অন্তরে আশা ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করে। দুনিয়ার বিপদাপদ ও পরীক্ষায় যখন মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কুরআনের এই সুসংবাদগুলো তাকে নতুন করে উজ্জীবিত করে। সমাজে যখন হতাশা ও নিরাশা ছড়িয়ে পড়ে, তখন কুরআনের এই সুসংবাদগুলো মুমিনকে ইতিবাচক চিন্তা ও কর্মের দিকে ধাবিত করে।

কাফেরদের জন্য সতর্কতা ও ভীতি প্রদর্শন

কুরআন অবতীর্ণের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, এই কিতাব অস্বীকারকারী ও কাফেরদের সতর্ক করতে এবং তাদের আযাবের প্রতি ভীত প্রদর্শন

করতে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ত্ব-হায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۙ﴿۲﴾
اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۙ﴿۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! আমি আপনার উপর এ কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন, হ্যাঁ, তারই জন্য উপদেশ, যে ভয় করে। (পারা: ১৬, সূরা ত্ব-হা: ২-৩)

সূরা হা-মীম সিজদায় ইরশাদ করেন:

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ
صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, 'আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি এক বজ্রপাত সম্পর্কে যেমন বজ্রপাত 'আদ ও সামুদের উপর এসেছিল।'

(পারা: ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা: ১৩)

সূরা ফুরকানেও একই বিষয় রয়েছে:

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ
لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ﴿۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি অবতীর্ণ করেছেন কুরআন আপন বান্দার প্রতি, যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন। (পারা: ১৮, সূরা ফুরকান: ১)

কুরআনের এই সতর্ককারী দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষকে তার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে। যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে, তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অত্যাচার ও ফাসাদে লিপ্ত থাকে, কুরআন তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে। এই সতর্কতা মূলত রহমতেরই অংশ, কারণ এর মাধ্যমে মানুষ তাওবা ও সংশোধনের সুযোগ পায়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর অবতীর্ণ হওয়া আযাবের আলোচনা এজন্যই করা হয়, যাতে বর্তমান প্রজন্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সমাজে যখন পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ নৈতিক সীমালঙ্ঘন করতে শুরু করে, তখন কুরআনের এই সতর্কবাণীগুলো তাদের জবাবদিহিতার দিকে আহ্বান করে। এই ভয় দেখানো কেবল আতঙ্কিত করা নয়, বরং মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা।

অন্তরের প্রশান্তি ও স্বস্তি

কুরআন অবতীর্ণের আরেকটি উদ্দেশ্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, এই কিতাব মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি ও স্বস্তি প্রদান করে। সূরা রা'দে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَىٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ
اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি পায়; শুনে নাও, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে। (পারা: ১৩, সূরা রা'দ: ২৮)

সূরা ইউনুসে ইরশাদ হয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে মানবকুল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হেদায়েত এবং রহমত ঈমানদারদের জন্য। (পারা:১১, সূরা ইউনুস: ৫৭)

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করে যে, কুরআন হলো অন্তরের মহৌষধ এবং রুহের খোরাক। যখন মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করে, এর মর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং এর হুকুম অনুযায়ী আমল করে, তখন তার অন্তরে এমন এক বিশেষ প্রশান্তি ও স্বস্তি তৈরি হয়, যা দুনিয়ার অন্য কোনো কিছু থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে যেখানে মানসিক রোগ, ডিপ্রেশন, অস্থিরতা ও উদ্বেগ মহামারী আকার ধারণ করেছে, সেখানে কুরআনের এই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকর। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهٖ مَا اسْتَطَعْتُمْ। "নিশ্চয়ই এই কুরআন আল্লাহর দস্তরখান, সুতরাং তাঁর দস্তরখান থেকে যতটুকু পারো শিক্ষা গ্রহণ করো।" (মু'জামু কবির, ৯/১৩০, হাদিস: ৮৬৪৬) সমাজে যখন মানুষ কুরআনের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করে, তখন তাদের মধ্যে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, তাওয়াক্কুল এবং সন্তুষ্টির মতো গুণাবলী সৃষ্টি হয়, যা জীবনের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সহায়তা করে।



ব্যবসার আহকাম

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) জিনিস বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসয়ালা সম্পর্কে কী বলেন যে, একজন মহিলার কাছে যখন কেউ ঋণের আবেদন করে, তখন তিনি সেই ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতার কোনো মূল্যবান জিনিস যেমন: স্বর্ণ ইত্যাদি জামানত হিসেবে রাখেন এবং এরপরই ঋণ দেন। তবে ঋণের উপর তিনি কোনো অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন না এবং ঋণগ্রহীতার রাখা জিনিসটি নিজের কাজে ব্যবহারও করেন না। আপনার কাছে জানার বিষয় হলো, এভাবে মূল্যবান জিনিস জমা রেখে ঋণ গ্রহণ করা কি শরীয়তসম্মত?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: ঋণদাতার ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতার কোনো জিনিস জামানত হিসেবে নিজের কাছে রাখাকে শরীয়তের পরিভাষায় “বন্ধক” বলা হয়। বন্ধক রাখা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া বন্ধক রাখাতে উভয় পক্ষেরই উপকার রয়েছে, তা এভাবে যে, ঋণদাতা তার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হন এবং ঋণগ্রহীতা তার প্রয়োজনীয় ঋণ সহজেই পেয়ে যান। স্পষ্ট হলো যে, জিজ্ঞাসিত অবস্থায় নিজের মূল্যবান জিনিস জমা দিয়ে ঋণ গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত।

তবে এই মাসয়ালাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঋণদাতার জন্য বন্ধক রাখা জিনিস দ্বারা কোনো ধরনের শর্তযুক্ত উপকারিতা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে সুদি কারবার, তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক ও জরুরি।

ঋণ নিয়ে নিজের মাল বন্ধক রাখা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যদি তোমরা সফরে থাকো এবং লিখক না পাও, তবে বন্ধক থাকবে হাতে (অধিকারে) প্রদত্ত। (পারা ৩, সূরা বাকারা: ২৮৩)

এই আয়াতে মুবারকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "অর্থাৎ কোনো বস্তু ঋণদাতার হাতে বন্ধকরূপে প্রদান করো। **মাসয়ালা:** এটা মুস্তাহাব আর সফরের অবস্থায় 'বন্ধক প্রদান করা' আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং সফর ব্যতীত অবস্থায় হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেহেতু রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা তৈয়্যিবার মধ্যে নিজের 'যিরাহ মুবারক' (বর্ম অথবা যুদ্ধের পোশাক বিশেষ) ইহুদির নিকট বন্ধক রেখে বিশ সা' যব নিয়েছিলেন। **মাসয়ালা:** এই আয়াত দ্বারা 'বন্ধক' এর বৈধতা এবং অধিকারভুক্ত হওয়া পূর্বশর্ত বলে প্রমাণিত হয়।"

(খাযায়িনুল ইরফান, পৃষ্ঠা: ১০৫)

বন্ধক থেকে শর্ত দিয়ে উপকারিতা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে সুদি কারবার। যেমনটা ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "বন্ধকের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উপকারিতার শর্ত নিঃসন্দেহে হারাম এবং খাঁটি সুদ, বরং এই অঞ্চলে বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধক রাখা বস্তু থেকে শর্তহীনভাবে উপকার ভোগ করাও মূলত প্রথা অনুযায়ী শর্ত দিয়ে উপকার ভোগের হুকুমেই, যা সুস্পষ্ট সুদ।" (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৫/৫৭)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) বন্ধক রাখা বস্তুর উপর যাকাত নেই

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসয়ালা সম্পর্কে কী বলেন যে, একজন মহিলার নিকট সোনার সেট ছিল যা তিনি প্রয়োজনে কারো কাছে বন্ধক রেখে ঋণ নিয়েছিলেন, এখনো ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এই গয়নার যাকাত কি ওই মহিলাকে দিতে হবে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত সোনার সেটটি বন্ধক থাকবে, সেই সময়ের জন্য সোনার সেটের উপর যাকাত আবশ্যক হবে না। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় রয়েছে: "দ্বিতীয় অবস্থায় (ঋণগ্রহীতার গয়না বন্ধক রাখা অবস্থায়) ওই গয়না তারই, কিন্তু তার উপর এর যাকাত ওয়াজিব নয় যতক্ষণ তা বন্ধকগ্রহীতার দখলে থাকে।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/১৩৪)

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: "বন্ধক রাখা বস্তুর যাকাত বন্ধকগ্রহীতার উপর নেই, বন্ধকদাতার উপরও নেই। বন্ধকগ্রহীতা তো মালিকই নন আর বন্ধকদাতার মালিকানা পূর্ণাঙ্গ নয় কারণ তা তার দখলে নেই আর বন্ধক ছাড়ানোর পরও ওই বছরগুলোর যাকাত ওয়াজিব নয়।"

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৭৭)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) ৯৯ টাকার জিনিসের ১০০ টাকা উসুল করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসয়ালা সম্পর্কে কী বলেন যে, আমরা অনেক জিনিসের দাম ৯৯ বা ৯৯৯ বা এই ধাঁচে নির্ধারণ করি এবং ক্রেতা আমাদের ৯৯ এর বদলে ১০০ এবং ৯৯৯ এর বদলে ১০০০ টাকা দেয়। আমরা কি অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেব নাকি রাউন্ড ফিগার হিসেবে টাকা কেটে রাখার অনুমতি আমাদের আছে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: সাধারণত ৯৯ এর অংকটি এই উদ্দেশ্যে লেখা হয় যেন এক টাকা বা সামান্য কম করে পরবর্তী বড় সংখ্যার দিকে ক্রেতার মন যাওয়া থেকে আটকানো যায়। যেমন ৯৯৯ লেখা হলে ক্রেতার ধারণা হবে যে, এই জিনিসটির দাম হাজারের চেয়ে কম। এটি কোনো ধোঁকা নয়, বরং এক ধরনের মার্কেটিং কৌশল, যা অবলম্বন করায় কোনো দোষ নেই। তবে যিনি ৯৯ বা ৯৯৯ লিখেছেন, তিনি যেন খুচরা টাকা রাখার ব্যবস্থাও করেন, এটি তার জন্য জরুরি। কারণ যখন তিনি নিজেই দাম ৯৯ বা ৯৯৯ টাকা ঘোষণা করেছেন, তখন বিক্রি হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ঘোষিত মূল্যই ক্রেতার কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী। ক্রেতা যদি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি টাকা দেয়, তবে বেশি দেওয়া টাকা বিক্রেতার জন্য তখন হালাল হবে যখন ক্রেতার প্রকৃত সন্তুষ্টি থাকে।

যদি ক্রেতা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি টাকা দিতে রাজি না হয় অথবা বেশি দেওয়া টাকা ফেরত চায়, তবে এখন ক্রেতার অনুমতি বা সন্তুষ্টি ছাড়া নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি টাকা কেটে রাখা বিক্রেতার জন্য হালাল নয়। তার উপর এটাই আবশ্যক যে, এই টাকা ক্রেতাকে ফেরত দেবে।

সদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "যত টাকায় জিনিস কিনেছে, বিক্রেতাকে তার চেয়ে কিছু বেশি দিল, এমতাবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে (ক্রেতা) একথা বলবে না যে, এই বাড়তি অংশ তোমার জন্য হালাল অথবা আমি তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম, ততক্ষণ ওই বাড়তি অংশ নেওয়া জায়িয নয়।" (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৮০)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



গোড়ালির আঘাতে ঝর্ণা প্রবাহিত হলো

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তায় আল্লাহ পাকের কুদরতের ঝলক দেখা যায়। আল্লাহ পাক তাঁকে এমন অসংখ্য মু'যিজা দান করেছেন, যা কেবল তাঁর নবুওয়াতের সত্যতাই প্রকাশ করেনি, বরং মানবিক সহানুভূতি এবং চিরস্থায়ী ঈমান উদ্দীপক উপকরণও হয়েছে। আসুন আজ এমনই একটি মু'যিজা সম্পর্কে শুনি:

আবু তালিব বলেন যে, আমি আমার ভাতিজা অর্থাৎ হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে 'জুল মাজায'-এ ছিলাম (এটি আরাফাত থেকে এক ফারসাখ [প্রায় তিন মাইল] দূরে অবস্থিত একটি জায়গা, যেখানে জাহেলিয়্যাতের যুগে বাজার বসত)। হঠাৎ আমার পিপাসা পেল। আমি তাঁকে বললাম: ভাতিজা! আমার খুব পিপাসা পাচ্ছে। আমি এ কথাটি কেবল পিপাসার অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার কারণেই বলেছিলাম, এই ভেবে নয় যে, আমার তাঁর নিকট পানি নজরে পড়ছিল।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বাহন থেকে নেমে বললেন: চাচা! সত্যিই কি আপনার পিপাসা পেয়েছে? আমি উত্তর দিলাম: হ্যাঁ। তারপর তিনি নিজের গোড়ালি মাটিতে অথবা কোনো পাথরে আঘাত করে কিছু পড়লেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি পানির একটি ঝর্ণার উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম (অর্থাৎ সেখানে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল)। আমি এমন পানি আগে কখনো দেখিনি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "পান করুন।" আমি এতটাই পান করলাম যে, আমার পিপাসা মিটে গেল। তারপর তিনি গোড়ালি দিয়ে আঘাত করে পাথরটিকে তেমনই করে দিলেন যেমনটি আগে ছিল। (সীরাতে হালবিয়া, ১/১৭০)

سُبْحٰنَ اللهُ! গোড়ালি মাটিতে বা পাথরে আঘাত করে তা থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেওয়া আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মুহাম্মদে আরবি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মু'যিজা। এই ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিখতে পারি:

অন্যের সমস্যার কথা চিন্তা করে নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আল্লাহওয়ালাদের দরবার থেকে এমন সব কাজ হয়ে যায়, যা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

কখনো কখনো কঠিন সময়ে এমন সাহায্য পাওয়া যায়, যার ধারণাও থাকে না, এটি আল্লাহর বিশেষ রহমতে হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা সম্মান ও ক্ষমতা দান করেন, তিনি কোনো বাহ্যিক কারণ ছাড়াই বড় কাজ করতে পারেন।

কিছু বিষয় দেখে মানুষের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে, আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন এবং নেককাররা তাঁর বিশেষ বান্দা হয়ে থাকেন।

আল্লাহওয়ালারা অন্যদের সাহায্য এমনভাবে করেন যাতে সামনের ব্যক্তি লজ্জিত না হয় এবং কাজও সহজে হয়ে যায়।

এমন আচরণ যা মনকে খুশি করে দেয়, তা সবসময় মনে থাকে এবং হৃদয়ে স্থান করে নেয়।

একজন ভালো মানুষের এটাই শোভা পায় যে, তিনি অন্যদের জন্য উপকারী হবেন।

পানি বা ব্যবহারযোগ্য যেকোনো জিনিস অপচয় করা উচিত নয় এবং অকারণে ফেলে রাখা উচিত নয়।

বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অযিফা পাঠ এবং দোয়ার আশ্রয় নেওয়া উপকারী।

শরীয়তের আহকামের হিকমত

জামাআত সহকারে নামাযের হিকমত



মাওলানা আবরার আখতার কাদেরী

নিঃসন্দেহে জামাআত সহকারে নামায হলো ইসলামী নিদর্শন, যার মধ্যে ঈমানের উষ্ণতা, বন্দেগির রুহ এবং উম্মতের ঐক্যের বাস্তবতা ফুটে ওঠে। এ কারণেই ইসলাম মানুষকে ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি সামষ্টিক ইবাদত ব্যবস্থারও অনুসারী করেছে, যাতে বন্দেগি কেবল ব্যক্তিগত অবস্থায় না থাকে বরং উম্মতের সামষ্টিক শানে পরিণত হয়। কুরআনুল করীম জামাআতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে জোর দিয়ে ইরশাদ করেছে:

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো। (পারা:২, সূরা বাকারা: ৪৩)

সম্মিলিত ইবাদতের গুরুত্বের প্রতি উৎসাহ দিয়ে হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً অর্থাৎ জামাআত সহকারে নামায পড়া একা পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি উত্তম। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ২৫৬, হাদিস: ১৪৭৭) এই বর্ণনায় যেন এই বিষয়ের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, বান্দা যেন তার নামাযকে কেবল ফরয আদায় মনে না করে, বরং উম্মতের শৃঙ্খলার ব্যবহারিক অনুশীলন হিসেবে আদায় করে। যেহেতু এখানে জামাআত সহকারে নামাযের ফযিলত বর্ণনার পরিবর্তে জামাআত সহকারে নামাযের হিকমত (প্রজ্ঞা) বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তাই আসুন! এই বিষয়টি পর্যালোচনা করি যে, জামাআত সহকারে নামায আদায়ের যে নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাতে কী কী হিকমত নিহিত থাকতে পারে:

জামাআত সহকারে নামায আদায়ের হিকমতগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী বলেন: জামাআত সহকারে নামায আদায় করার দ্বীনি বা পার্থিব অনেক হিকমত রয়েছে:

পার্থিব হিকমতগুলো হলো: ✯ জামাআতের বরকতে সম্প্রদায়ে মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকে কারণ মুসলমানরা তাদের প্রতিটি কাজের জন্য ইমামের মতো সভাপতি ও আমির নির্বাচন করে নেয়। ✯ অতঃপর আমিরের এমন আনুগত্য করে, যেমন মুক্তাদি। ✯ ইমামের জামাআতের কারণে নিজেদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়, দৈনিক পাঁচবার সাক্ষাতের অভ্যাস গড়ে ওঠে যে, সব লোক জামাআতের সময়ে দৌঁড়ে আসে। ✯ জামাআতের কারণে অহংকারীদের অহংকার চূর্ণ হয় যে, এখানে বাদশাহকে ফকিরের সাথে দাঁড়াতে হয়।

দ্বীনি উপকারীতাগুলো হলো: ✯ যদি জামাআতে একজনের নামায কবুল হয়ে যায়, তবে সবার নামায কবুল হয়ে যায়। জামাআতে যেন মুসলমানদের প্রতিনিধিদল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয় এবং এটা স্পষ্ট যে, শাসকের কাছে একার চেয়ে প্রতিনিধিদলের সম্মান বেশি থাকে। ✯ জামাআতে মানুষ প্রতিপালকের আদালতে উকিল অর্থাৎ ইমামের মাধ্যমে আবেদন নিবেদন উপস্থাপন করে, এতে কথার ওজন বেড়ে যায়। ✯ জামাআতের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনি নেতা, আলেম ও সুফিদের আদব করাটা শেখানো হয়।

জুমা ও ঈদে জামাআত ফরয হওয়ার আরও হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: পাঁচ ওয়াক্তের জামাআত হলো পুরো মহল্লার সম্মেলন এবং জুমার জামাআত হলো পুরো শহরের বা অধিকাংশ লোকের সম্মেলন। পাঁচ ওয়াক্ত জামাআত (সবার জন্য সব জায়গায়) ফরয করাতে মুসলমানদের জন্য অসুবিধা হতো কারণ জঙ্গল, খেত ইত্যাদি থেকে দৌঁড়ে শহরে আসতে হতো। তাই এই জামাআতকে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যেহেতু জুমা সপ্তাহে একবার এবং ঈদ বছরে দু'বার আসে, তাই এগুলোর জন্য আসাটা অতটা কঠিন হবে না। উদ্দেশ্য হলো যে, মুসলমানদের সমাবেশও হয়ে যাবে এবং কাজকর্মও বন্ধ হবে না। (রাসায়িলে নঈমিয়া, আসরারুল আহকাম, পৃষ্ঠা ২৮৮ থেকে ২৮৯)

আলা হযরতের সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মুফতি নকী আলী খান জামাআত সহকারে নামাযের যে হিকমতগুলো বর্ণনা করেছেন, তার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো: শরিয়তসম্মত জামাআত হওয়ার একটি হিকমত এটিও যে, কারো নামাযে খুশু এবং কারো খুযু, কারো আবেগ ও উদ্দীপনা আর কারো বন্দেগির আদব রক্ষা এবং কারো গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বেশি থাকে। এদের সবার অবস্থা মিলিত হয়ে জামাআত সহকারে নামায এমন এক সামষ্টিক অবস্থার সৃষ্টি করে, যা ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব হয় না। (যেন বিভিন্ন হৃদয়ের আধ্যাত্মিকতা, ভীতি, ভালোবাসা এবং বন্দেগি মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদতের রূপ ধারণ করে।)

ওলামায়ে কিরাম বলেন: জামাআত সহকারে নামাযের চারটি উপকারিতা রয়েছে:

(১) নামাযীদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে থাকে। (আর এভাবে ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ শক্তিশালী হয়।)

(২) যখন মানুষ অন্যদের ইবাদতে লিপ্ত দেখে, তখন তার মধ্যেও ইবাদতে আনন্দ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং শয়তানের প্ররোচনা দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৩) জামাআতে ঈমানদারদের অন্তরের প্রভাব একে অপরের উপর পড়ে এবং নেককারদের সাহচর্য গুনাহগারদের জন্যও ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যায়। কেননা নেককারদের কাছে বসা ব্যক্তিও হতভাগা থাকে না।

(৪) মুসলমানদের সমাবেশ বরকত ও দ্বীনি উপকারিতা অর্জনের মাধ্যম। যেমন; ✯ অজ্ঞরা আলেমদের কাছ থেকে মাসয়ালা শেখে। ✯ আগ্রহহীনদের মধ্যে আল্লাহ প্রেমীদের আগ্রহ দেখে খোদার বন্দেগির আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহভীরুদের খুযু ও খুশু দেখে অন্যদের অন্তরেও ভয় সৃষ্টি হয়। ✯ বেপরোয়া লোকেরা সতর্কদের সতর্কতা দেখে অসতর্কতা ও বেপরোয়া ভাব থেকে বিরত থাকে।

(জাওয়াহিরুল বায়ান ফি আসরারিল আরকান, পৃষ্ঠা: ৬৯)

মোদ্দাকথা বলা যেতে পারে যে, জামাআত সহকারে নামায প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শরীয়তের সেই ব্যাপক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণকে একত্র করে। কারণ এতে মানুষ নিজের আমিত্বকে মুছে দিয়ে জামাআতের কাতারে সবার সমান হয়ে দাঁড়ায়, যা সাম্য, ঐক্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যবহারিক শিক্ষা। এটাই সেই স্থান, যেখানে ধনী ও গরিব, আলেম ও সাধারণ মানুষ, সর্দার ও শ্রমিক সবাই এক কাতারে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে নিজেদের বন্দেগির সম্পর্ককে সজীব করে। এই সামষ্টিকতার ফলে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, অভ্যন্তরীণ স্বস্তি এবং দ্বীনি দৃঢ়তা লাভ করে আর সমাজ ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সহানুভূতির লালনক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সুতরাং জামাআত সহকারে নামায কেবল ঈমান ও একনিষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং ইসলামী সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার জামিনদারও বটে; যা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ও শরীয়তের হিকমতগুলোর উপর আমল করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার যোগ্য করে তোলে।



হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

মহান সেনাপতি এবং প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর পুরো নাম শুরাহবিল বিন আবদুল্লাহ, আর সাহাবিয়া বিবি "হাসানা" ছিলেন তাঁর মায়ের নাম। (মুস্তাদরাক, ৪/৩১৪, হাদিস: ৫২৫১) তিনি ইসলামের ইতিহাসের সেই মহান মনিষীদের অন্যতম, যিনি তাঁর চরিত্র, সাহসিকতা এবং তাকওয়ার মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে গভীর ছাপ রেখেছেন।

ফযিলত: হযরত শুরাহবিল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সাহাবী এবং কাতিবে ওহী এর মধ্যে গণ্য করা হয়। (ফুতুহুশ শাম, ১/২০৬) তিনি তাঁর মা, ভাই এবং দুই ভাতিজার সাথে হাবশার দিকে হিজরত করেছিলেন, এরপর ৭ম হিজরিতে যখন হযরত জাফর এবং অন্যান্য মুহাজিরগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ হাবশা থেকে মদীনায় পৌঁছান, তখন তিনিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২২/৪৬৭-৪৭১) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই মহান সেনাপতিদের একজন, যাঁদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সিরিয়া বিজয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। (মুস্তাদরাক, ৪/৩১৫, হাদিস: ৫২৫৬) জর্ডানের সমস্ত শহর ও দুর্গ বিজয়ের গৌরব হযরত শুরাহবিল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অংশেই পড়ে। (ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা:১৬৯)

যুহুদ, তাকওয়া ও সরলতা: তাঁর জীবন ছিল যুহুদ ও তাকওয়ার সর্বোত্তম নমুনা। সরলতার অবস্থা এমন ছিল যে, একবার হযরত শিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর বাড়িতে আসেন। তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ঘরেই ছিলেন। তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন যে, নামাযের সময় হয়েছে আর আপনি এখানেই বসে আছেন। তিনি নম্রভাবে উত্তর দিলেন: হে ফুফু! আমাকে তিরস্কার করবেন না, আমাদের কাছে দুটি কাপড় ছিল যার একটি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ধার নিয়েছেন। হযরত শুরাহবিল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, দ্বিতীয় কাপড়টি ছিল একটি (পুরনো) জামা, যাতে তালি লাগানো ছিল। (মুস্তাদরাক, ৫/৭৭, হাদিস: ৬৯৭৬)

দামেস্ক বিজয় এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ: হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ছিলেন একজন অকুতোভয় সেনাপতি। দামেস্ক বিজয়ের সময় যখন রোমান বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, তখন তিনি উচ্চস্বরে আহ্বান জানালেন: হে মুসলমানরা! নিজেদের জীবনের পরোয়া করো না এবং নিজেদের প্রতিপালকের কাছ থেকে জান্নাতের প্রত্যাশী হও। নিজেদের কর্ম দিয়ে নিজেদের স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করো, কারণ

আল্লাহ তোমাদের পলায়নকে পছন্দ করেন না। তাদের উপর আক্রমণ করো, আল্লাহ তোমাদের উপর বরকত অবতীর্ণ করবেন। এ কথা শুনে মুসলমানরা এক তীব্র আক্রমণ চালাল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। (ফুতুহুশ শাম, ১/৬৬)

১৫ হিজরিতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি রোমান কমান্ডারের মুখোমুখি হন এবং দুজনের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি এক রণকৌশল অবলম্বন করে পিছু হটেন। কমান্ডার যখন তাঁকে তাড়া করল, তখন তিনি হঠাৎ ঘুরে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করেন, কিন্তু কমান্ডার বেঁচে যায়। দুজনের মধ্যে আবারও তীব্র লড়াই হলো, এমনকি উভয়ের তলোয়ার ভেঙে গেল। তাঁরা একে অপরের গলা চেপে ধরলেন। কমান্ডার শারীরিকভাবে খুব ভারী এবং শক্তিশালী ছিল, আর তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। কমান্ডার তাঁকে এত জোরে চেপে ধরল যে, তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, এমন সময় হযরত যরার বিন আযওয়ার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজেকে বললেন: হে যরার! তোর প্রতি আফসোস, প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাতিবে ওহী শহীদ হয়ে যাবেন আর তুমি চেয়ে চেয়ে দেখবে? অতএব দ্রুত দৌঁড়ে এলেন এবং পেছন থেকে ওই রোমান কমান্ডারকে খঞ্জর মেরে হত্যা করে দিলেন।

(ফুতুহুশ শাম, ১/২০৬)

একটি অলৌকিক সাহায্য: কায়সারিয়ার যুদ্ধে রোমানদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার, আর মুসলমানরা ছিল মাত্র ৫ হাজার। সেই সময় প্রচণ্ড শীত ছিল এবং আকাশে মেঘ ছিল। হযরত শুরাহবিল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এবং রোমান কমান্ডার কাইদমুনের মধ্যে লড়াই চলছিল, হঠাৎ মশকের মুখ খোলার মতো তীব্র বৃষ্টি শুরু হলো। এতে দুজনেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং কাদার মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে থাকেন। এরই মধ্যে কাইদমুন তাঁকে আক্রমণ করল এবং তাঁকে তুলে পিঠের উপর মাটিতে আছাড় মারল, তারপর বুকের উপর চড়ে তাঁকে জবাই করতে চাইল। এই মুহূর্তে তিনি ডাকলেন: يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْن অর্থাৎ হে সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্যকারী! ঠিক তখনই রোমান সেনাবাহিনী থেকে সোনালী বর্ম পরিহিত, উন্নত জাতের ঘোড়ায় আরোহী এক যোদ্ধা বের হলো এবং সোজা সেই দিকেই এলো। কাইদমুন ভাবল যে, সে তাকে তার ঘোড়া দিতে এবং সাহায্য করতে এসেছে। কিন্তু অশ্বারোহী কাছে আসতেই ঘোড়া থেকে নামল এবং কাইদমুনকে লাথি মেরে ফেলে দিল এবং তাঁকে বলল: হে আল্লাহর বান্দা! সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্যকারীর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সাহায্য এসে পৌঁছেছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং অবাক হয়ে সেই অশ্বারোহীর দিকে তাকাতে লাগলেন, অশ্বারোহীর মুখে নেকাব ছিল। এরপর সে তার তলোয়ার বের করল এবং এক আঘাতেই কাইদমুনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। হযরত শুরাহবিল তাকে বললেন: আল্লাহর কসম! আমি তোমার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিনি, তুমি তো রোমান বাহিনীর দিক থেকে এসেছিলে। অশ্বারোহী বলল: আমি সেই হতভাগা এবং ধিক্কৃত ব্যক্তি তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ, যে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওফাতের পরে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করেছিল এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যা

আরোপ করেছিল। হযরত শুরাহবিল বললেন: হে আমার ভাই! আল্লাহর রহমত প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে রেখেছে এবং যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন এবং তার পর্ববতী গুনাহ ক্ষমা করে দেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাওবা পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মুছে দেয়। তুলাইহা বলল: আমার নিকট ফিরে আসার কোনো কারণ নেই যে, আমি ইসলামের দিকে ফিরে আসব। তারপর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তাকে আটকে দিলেন এবং বললেন: আমি তোমাকে এভাবে যেতে দেব না, বরং তুমি আমার সাথে মুসলিম বাহিনীতে চলো। তুলাইহা বলল: আমার ভয় হচ্ছে যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ আমাকে হত্যা করবেন। তিনি বললেন: হযরত খালিদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাহিনীতে নেই, সেনাপতি হলেন হযরত আমর ইবনে আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তারপর তিনি তুলাইহাকে নিজের সাথে মুসলিম বাহিনীতে নিয়ে এলেন। সেনাপতি হযরত আমর ইবনে আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তুলাইহাকে দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন এবং স্বাগত জানালেন (এভাবে হযরত তুলাইহা ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন এবং খুব ভালো মুসলমান হিসেবে প্রমাণিত হন)। (ফুতুহুশ শাম, ২/২২-২৩। আল মিসবাহুল মুদ্বি লি ইবনিল হাদিদা, পৃষ্ঠা: ১০৬-১০৭)

আমওয়াসের প্লেগ মহামারীতে ঈমানি অভিব্যক্তি: ১৮ হিজরিতে যখন সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, তখন তৎকালীন সিরিয়ার গভর্নর লোকদের বললেন যে, এটি একটি আযাব, তাই এটি থেকে বাঁচার জন্য পাহাড় এবং উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ো। যখন এই কথা হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য পেয়েছি, এই (মহামারী) তোমাদের প্রতিপালকের রহমত এবং তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের মৃত্যুর মাধ্যম।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ১০/১৬৯, হাদিস: ২০৩৩৩)

ফারুকী খিলাফত এবং বরখাস্ত: যখন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খলিফা হলেন, তখন তিনি হযরত শুরাহবিলকে বরখাস্ত করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: হে আমিরুল মুমিনীন! আমি কি কোনো খেয়ানত করেছি নাকি আমি এই কাজের জন্য অযোগ্য হয়ে গেছি? ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: না আপনি খেয়ানত করেছেন, আর না আপনি অযোগ্য। তিনি আরয করলেন: তাহলে আমাকে কেন বরখাস্ত করলেন? তিনি বললেন: যখন আমি আরও বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি পেয়ে গেছি, তখন আপনাকে নেতা বানাতে আমার দ্বিধা হচ্ছে। তিনি আরয করলেন: এই কথাটি মানুষের সামনেও বলে দিন যে, আমি কোনো খেয়ানত করিনি এবং আমি অযোগ্য নই। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক এই কথা মানুষের সামনে ঘোষণা করে দিলেন।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৫/৩১৪, হাদিস: ৯৮৩৩)

ওফাত: হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ১৮ হিজরিতে আমওয়াসের প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (মুস্তাদরাক, ৪/৩১৫, হাদিস: ৫২৫৪) তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর পুরো জীবন ইসলামের খেদমত, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং যুহুদ ও ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন এবং আগত প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।



(পর্ব: ০১)

ইসলামী সমাজই হলো আদর্শ সমাজ

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

আল্লাহ করীম মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবীতে বাস করিয়েছেন, নবী ও রাসূলদের পাঠিয়ে তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে ঈমান দান করেছেন এবং জীবন অতিবাহিত করার জন্য কুরআনে পাকের মতো শাশ্বত ও অতুলনীয় জীবনবিধান দিয়েছেন। ইবাদত ও রিয়াযতের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দান করেছেন। ইসলামী শিক্ষাকে আল্লাহ করীম এমন সৌন্দর্য দান করেছেন যে, যেই ব্যক্তি বা সমাজ তা গ্রহণ করে নেয়, সেই ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় এবং সেই সমাজ প্রবাদতুল্য হয়ে ওঠে। খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন যে, ইসলামী শিক্ষা কেবল রুকু ও সিজদার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নক্ষত্রের ওপারে আরও জগত আছে এর মতো যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শিক্ষা এবং আল্লাহ পাকের হুকুমগুলোকে দেখা হয়, তবে মনে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছা এটাই যে, মানুষ পৃথিবীতে থেকে নিজেকে রুকু ও সিজদা, রোযা ও নামায, হজ্জ ও যাকাতের অনুসারি করার পাশাপাশি এই নেক কাজগুলোকেও নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (যা আলাদা করা যায় না, অপরিহার্য অংশ) বানিয়ে নিক; যা সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, দয়া, শুভাকাঙ্ক্ষা, মানবসেবা, অনুভূতি, সহনশীলতা, ধৈর্য, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, পরিচ্ছন্নতা, অধিকার রক্ষা, মিসকীন ও এতিমের সাহায্য, রোগীর সেবা এবং অভাবীর সহায়তার মতো মহৎ গুণাবলী কেবল প্রতিষ্ঠিতই করবে না, বরং সেগুলোর উন্নতি ও প্রসারের মাধ্যম এবং উপলক্ষ্যও হবে।

ইসলামী শিক্ষার বরকত: মনে রাখবেন! ইসলাম সমাজকে কঠিন ও শ্বাসরুদ্ধকর করে তোলে না, বরং এর মহৎ শিক্ষাগুলো যদি কোনো একটি ঘরে বাস্তবায়ন করা হয়, তবে সেই ঘর মহাবিশ্বের জন্য ঈর্ষণীয় ঘরে পরিণত হবে। যদি কোনো একটি মহল্লা, গলি বা টাউন, শহর এককথায় কোনো পুরো দেশে ইসলামকে কার্যত চালু করা হয়, তবে সেই গলি, মহল্লা, টাউন এবং দেশ ও শহর সারা বিশ্বের মানুষের জন্য ঈর্ষণীয় এবং অনুসরণীয় হয়ে উঠবে। এটি কেবল দাবিই নয়, বরং আসুন আপনাকে এই অতুলনীয়

সমাজের একটি সামান্য ঝলক দেখাই। আল্লাহ করীম ইরশাদ করেন:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কোন মৌলিক পূণ্য এ নয় যে, পর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে হাঁ, আল্লাহ, ক্বিয়ামত-দিবস, ফিরিশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের উপর আল্লাহর প্রেমে আপন প্রিয় সম্পদ দান করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, মিসকীনগণ, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদেরকে আর গর্দানসমূহ মুক্তকরণে; এবং নামায কায়েম রাখবে ও যাকাত প্রদান করবে। আর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণকারীরা যখন প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ধৈর্যধারণকারীরা বিপদে, সংকটে এবং জিহাদের সময়। এরাই হচ্ছে- ঐসব লোক, যারা আপন কথা সত্য প্রমাণ করেছে এবং এরাই হচ্ছে খোদাভীরু। (পারা: ২, সূরা বাকারা: ১৭৭)

এই একটি আয়াতে ঈমানের পর ছয়টি জায়গায় সম্পদ খরচ করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে: (১) আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করা, (২) এতিমদের জন্য খরচ করা, (৩) মিসকীনদের জন্য খরচ করা, (৪) মুসাফিরদের জন্য খরচ করা, (৫) ভিক্ষুকদের দেওয়া, (৬) গর্দান মুক্ত করার (ঋণ বা দাসত্ব থেকে মুক্তির) জন্য খরচ করা। মুসলমানদের যে ভূখণ্ডে কার্যত এই আয়াতের বাস্তবায়ন হবে, ভেবে দেখুন সেই সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ভ্রাতৃত্বের কেমন চমৎকার ব্যবহারিক নমুনা হয়ে উঠবে।

ইসলাম তোমার জন্য উৎসর্গ: এ ধরনের অনেক আয়াতে করীমা এবং অসংখ্য হাদিসের উপর চিন্তা করলে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে যে, কিছু আমল এমন আছে যাতে বাহ্যত না তো রুকু ও সিজদা আছে এবং না তাসবীহ ও তাহলীল আছে আর না এমন কোনো কাজ আছে, যাকে আল্লাহর ইবাদত বলা যেতে পারে; কিন্তু এই কাজে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিও আছে এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুশিও। কেন এমন?

এই নেকি এজন্য যে: আসলে অনেক আমল এমন আছে, যা সমাজকে সংশোধন করতে, তাতে শান্তি ও নিরাপত্তা আনতে এবং শুভাকাঙ্ক্ষা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করতে সহায়ক ও সাহায্যকারী। যা করলে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির কল্যাণ হয়, খোদার সৃষ্টি আরাম পায়, তারা বিশ্রাম পায়, তাদের অভিযোগ শোনা হয়, এভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ অন্তরের স্বস্তি লাভ করে। আর যেসব কাজে এ ধরনের গুণাবলী পাওয়া যায়, তা আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় মনে হয়। এজন্য যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ. فَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ অর্থাৎ সৃষ্টি হলো আল্লাহ পাকের পরিজন, তাই

মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিজনের সাথে ভালো আচরণ করে। (মু'জামু আওসাত, ৪/১৫৩, হাদিস: ৫৫৪১) যেহেতু আল্লাহ পাক সবার রিযিকদাতা, সৃষ্টি তাঁর রিযিকপ্রাপ্ত, সুতরাং তারা তাঁর পরিজন অর্থাৎ পালিত। তুমি ওই ব্যক্তির প্রতি খুব খুশি হও, যে তোমার গোলাম, বাঁদী, ছেলেমেয়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কারণ তারা তোমার পালিত; তেমনি যে কেউ আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সাথে ভালো কাজ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি খুশি হন। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৫৮২)

সে সবচেয়ে উত্তম: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে, যে অন্যদের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। (মুসনাদুশ শিহাব, ২/২২৩, হাদিস: ১২৩৪) এই হাদিসে পাকটি ব্যাপক; মুসলমান কাউকে দ্বীনি উপকার করুক, যেমন; কাউকে কালেমা পড়িয়ে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা, কাউকে শরয়ী মাসয়ালা শিখিয়ে দেওয়া, কাউকে কুরআনুল করীম পড়িয়ে শিখিয়ে দেওয়া, কারো উপর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালিয়ে তাকে গুনাহ থেকে তাওবা করানো ইত্যাদি; অথবা জাগতিক উপকার করুক, এতেও এমন প্রশস্ততা রয়েছে যে, কোনো একজন ব্যক্তিকে উপকার করল, যেমন; পথ হারানো ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, রাস্তায় পড়ে থাকা কোনো আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, মজলুমকে সাহায্য করা, কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সহায়তা দিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া, অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা পার করিয়ে দেওয়া, অভাবীর প্রয়োজন পূরণ করা, নিজের দক্ষতা অন্যকে শিখিয়ে উপকার করা, জায়িয কাজে কারো জন্য সুপারিশ করা, চিন্তিত মুসলমানের চিন্তা দূর করা; অথবা সামগ্রিকভাবে সমাজকে উপকার করা, যেমন; গ্রাম বা শহরে পানির ব্যবস্থা করা, পানির পান করার সিস্টেম লাগানো, রাতে গলিতে বাল্ব জ্বালিয়ে রাখা যাতে পথচারীদের সুবিধা হয়, গরিবদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস যেমন; পেরেক, পাথর, হাড় ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়া; এগুলো এমন কাজ যা দ্বারা অনেক মুসলমান উপকৃত হয়। সমাজকে আদর্শ সমাজ বানানোর কয়েকটি আমল এবং তাদের সাওয়াব ও প্রতিদান লক্ষ্য করুন এবং এগুলো গ্রহণ করার দৃঢ় সংকল্প করে অন্যদেরও উৎসাহ দিন:

(১) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো: হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ছিল যে কখনো কোনো নেক আমল করেনি, সে রাস্তা থেকে কাঁটাযুক্ত ডাল সরিয়ে দিয়েছিল; আল্লাহ পাক তার এই কাজ পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (দেখুন: আবু দাউদ, ৪/৪৬২, হাদিস: ৫২৪৫) আল্লাহু আকবর! সামান্য আমলে এত বড় অনুগ্রহ! কিসের জন্য? এজন্য যে, এই কাজে সমাজ সংশোধিত হয়, খোদার সৃষ্টিরা আরাম ও শান্তি পায়, তাই এই আমলকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।

(২) ঋণ দেওয়া: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক ঋণ সদকা। (মু'জামু আওসাত, ২/৩৪৫, হাদিস: ৩৪৯৮) বরং একটি বর্ণনায় ঋণ দেওয়ার সাওয়াব সদকা করার চেয়েও বেশি বলা হয়েছে,

যেমনটি হাদিসে পাকে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ আমি শবে মেরাজে জান্নাতের দরজায় লেখা দেখেছি যে, সদকার সাওয়াব দশ গুণ এবং ঋণ দেওয়ার সাওয়াব আঠারো গুণ। আমি জিবরাঈলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যে, সদকা থেকে ঋণ উত্তম হওয়ার কারণ কী? তখন তিনি বললেনঃ (সদকা তো) সেও চায়, যে অভাবী নয়, কিন্তু ঋণপ্রার্থী প্রয়োজন ও অভাব ছাড়া ঋণ চায় না।

(ইবনে মাজাহ, ৩/১৫৪, হাদিসঃ ২৪৩১)

(৩) ফেরত নেওয়ার সাওয়াবঃ এক ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কিছু কিনল, এখন সে অনুভব করল যে, আমার এর প্রয়োজন নেই অথবা অন্য কোনো কারণে সে চায় যে, আমি মাল ফেরত দেব এবং আমার টাকা আমি পেয়ে যাব। যার কাছ থেকে মাল কিনেছে, সে তার কথা মেনে নিয়ে বিক্রি বাতিল করে দেয়, টাকা ফেরত দেয়, এতে প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন সুন্দর সুসংবাদ দান করেছেন! হাদিসে পাকে রয়েছেঃ যে তার ভাইয়ের সাথে ইকালা করল (অর্থাৎ সে যা কিনেছিল তা ফেরত দিলে তা নিয়ে নিল), তবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার পেরেশানী দূর করবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৪/১৯৯, হাদিসঃ ৬৫৩৮) আরেকটি বর্ণনায় রয়েছেঃ প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ যে কোনো মুসলমানের সাথে ইকালা করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।

(ইবনে মাজাহ, ৩/৩৬, হাদিসঃ ২১৯৯)

সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি এবং সফলতা সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার অসীম সমুদ্র থেকে এগুলো কয়েকটি মুক্তো মাত্র, যা দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইসলামের বার্তা আপাদমস্তক রহমত, কল্যাণ এবং মানবসেবার বার্তা। এই দ্বীন আল্লাহ পাকের বন্দেগির পাশাপাশি বান্দার খেদমতকেও ইবাদতের মর্যাদা দান করে। মুসলমানের প্রতিটি কথা ও কাজ তখনই প্রকৃত অর্থে গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তার অন্তরে স্রষ্টার ভালোবাসা এবং সৃষ্টির শুভাকাঙ্ক্ষা একত্রিত হয়। আজ মুসলিম উম্মাহ যেসব চিন্তাগত ও কর্মগত সংকটের সম্মুখীন, তার প্রকৃত সমাধান এটাই যে, আমরা আবার দ্বীনের দিকে ফিরে আসি এবং কুরআন ও সুন্নাহর জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করি। ইবাদতের সাথে খেদমত, যিকিরের সাথে ফিকির, এবং ঈমানের সাথে নেক আমলেকে আঁকড়ে ধরি। যখন ঈমানদার বান্দারা নিজেদের চরিত্রের মাধ্যমে শান্তি, ভালোবাসা, ন্যায়বিচার এবং ভ্রাতৃত্বের পতাকাবাহী হবে, তখন নিশ্চিতভাবে পৃথিবীতে সেই শান্তি ও রহমতের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা মদীনা তৈয়্যিবার প্রাথমিক সমাজে দেখা গিয়েছিল। আসুন! আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, নিজেদের জীবনকে আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষার আয়না বানাব, নিজেদের কথা ও কাজ দিয়ে খোদার সৃষ্টির জন্য সহজতা সৃষ্টি করব এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষাগুলোকে নিজেদের চরিত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে জীবন্ত উদাহরণ বানিয়ে দেব। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সত্যবাদিতা, নম্রতা, শুভাকাঙ্ক্ষা এবং মানবসেবামূলক সম্পদ দ্বারা ধন্য করুক।



মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ পাককে দেখেছেন

প্রশ্ন: আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি মেরাজের রাতে আল্লাহ পাককে দেখেছিলেন?

উত্তর: নিঃসন্দেহে প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে আল্লাহ পাককে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন, এটি প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্য। (দেখুন: বাহারে শরীয়ত, ১/৬৭-৬৮) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া কেউ দেখেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দেখতেও পারবে না। হ্যাঁ! জান্নাতে জান্নাতীদের আল্লাহ পাকের দিদার হবে, (দেখুন: বাহারে শরীয়ত, ১/১৬২) আমরাও জান্নাতে প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে আল্লাহ পাকের দিদার করব, اِنْ شَآءَ الله

(মাদানী মুযাকারা, ২৭ রজব শরীফ ১৪৪৪ হি.)

تَبَارَکَ اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی
کہیں تو وہ جوشِ لن ترانی کہیں تقاضے وِصال کے تھے

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা:২৩৪)

(২) দাজ্জাল থেকে হেফাজতের উপায়

প্রশ্ন: শুনেছি যে "যখন দাজ্জাল আসবে, তখন যার সূরা কাহফের শেষ আয়াত মুখস্থ থাকবে, কেবল সেই বাঁচতে পারবে।" এতে কতটা সত্যতা রয়েছে?

উত্তর: সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৩১৫, হাদিস: ১৮৮৩) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: যে সূরা কাহফের শেষ ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৩১৫, হাদিস: ১৮৮৪। মাদানী মুযাকারা, ২৪ মুহাররমুল হারাম ১৪৪২ হি.)

(৩) নামাযে সামনে বা পেছন থেকে কাপড় উঠানো কেমন?

প্রশ্ন: কিছু লোককে দেখা যায় যে, নামাযের সময় রুকু বা সিজদা থেকে ওঠার সময় জামা পেছন থেকে সরায় এবং ঠিক করে। এ ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কী?

উত্তরঃ বাহারে শরীয়তে নামাযের সময় কাপড় সামনে বা পেছন থেকে উঠানো মাকরুহে তাহরীমি লেখা হয়েছে। (দেখুনঃ বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৪) তবে যদি কোনো কারণ থাকে, যেমন; কিছু কাপড় এমন হয় যা আটকে যায়, তবে প্রয়োজনে কাপড় ছাড়িয়ে নেওয়াতে কোনো দোষ নেই। (মুখতাসার ফাতাওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, পর্ব ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৩) কিছু লোক আত্তাহিয়্যাত বা দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময়ও জামার একটি কোণা হাত দিয়ে ঠিক করে, অথচ এর কোনো প্রয়োজন হয় না। নামাযে এমন অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া করা উচিত নয়। যদি এমন নড়াচড়ার অভ্যাস থাকে, তবে তা একবার শুনেই যাবে না, বরং একে **Serious** (অর্থাৎ গুরুত্বের সাথে) নিতে হবে এবং কোনো ইসলামী ভাইয়ের ডিউটি লাগাতে হবে যে, "কখনো নামাযে আমার এমন কোনো নড়াচড়া দেখলে আমাকে বলবে।" এমনটা করলে اِنْ شَآءَاللّٰه অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ২৪ মুহাররামুল হারাম ১৪৪২ হি.)

(৪) তিলাওয়াত চলাকালীন মুহাম্মদ বলে দরুদ শরীফ পড়া এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা কেমন?

প্রশ্নঃ তিলাওয়াত শোনার সময় যদি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নাম আসে, তবে কি দরুদে পাক পড়তে হবে?

উত্তরঃ কুরআনের আয়াতে যখন মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম আসে, তখন বৃদ্ধাঙ্গুলিও চুম্বন করবেন না এবং দরুদে পাকও পড়বেন না, (বিস্তারিত জানার জন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, 'দাওয়াতে ইসলামী' এর ফতোয়া "কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতের সময় নামে মুহাম্মদে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা এবং দরুদ শরীফ পড়া" পড়ুন।)[১] কারণ যে কুরআনুল করীম শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছে, তার জন্য কুরআনুল করীম শোনা ফরয। (দেখুনঃ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৩১৬। মাদানী মুযাকারা, ২ সফরুল মুযাফফর ১৪৪২ হি.)

(৫) ধনী ও গরিবকে আলাদা আলাদা দাম বলা কেমন?

প্রশ্নঃ দোকানদারের কি ধনী ও গরিব **Customer** (অর্থাৎ ক্রেতা) কে জিনিসের আলাদা আলাদা দাম বলা সঠিক?

উত্তরঃ আলাদা আলাদা দাম বলাতে কোনো দোষ নেই। তবে ধোঁকা দেওয়া যাবে না (এবং মিথ্যা বলা যাবে না)।

(মাদানী মুযাকারা, ২ সফরুল মুযাফফর ১৪৪২ হি.)

(৬) সন্তান পুরুষের নসিবে এবং রিযিক নারীর নসিবে!!

প্রশ্নঃ এটা কি সত্য যে "সন্তান পুরুষের নসিবে হয় এবং রিযিক নারীর নসিবে পাওয়া যায়?"

উত্তরঃ আল্লাহ পাক ভালো জানেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব নসিব রয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে রিযিক দেওয়া নিজের দয়াময় দায়িত্বে নিয়েছেন। যদি আমরা নসিবের

1.https://www.fatwaqa.com/ur/fatawa/quran-aur-hadees/tilawat-ke-waqt-naam-e-muhammad-par-anguthe-chumna-aur-durood-shareef-parhna

ভাগ করি, তবে নিঃসন্তান ব্যক্তির কী হবে! তেমনি যে অবিবাহিত বা যার স্ত্রী মারা গেছে, সেই বেচারার রিযিকের কী হবে! এভাবে তো বিষয়টি ঝুলে যাবে। তাই মনে রাখুন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নসিবেরটা পায়। আল্লাহ পাকই পিঁপড়াকে "কণা" (অর্থাৎ কণা পরিমাণ) এবং হাতিকে "মণ পরিমাণ" দান করেন।

(মাদানী মুযাকারা, ২ সফরুল মুযাফফর ১৪৪২ হি.)

(৭) বিয়ের কার্ডে আল্লাহ-রাসূলের নাম

প্রশ্ন: অধিকাংশ লোক বিয়ের কার্ডে আল্লাহ পাক এবং মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম লেখে, কিন্তু যাদের ঘরে কার্ড যায় তারা এর আদব করে না। এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিন।

উত্তর: বিভিন্ন বই, পত্রিকা এবং চিঠিপত্র (letters) ইত্যাদিতে সাধারণত আল্লাহ পাক এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম লেখা থাকে। প্রত্যেক মুসলমান জানে যে, এই পবিত্র নামগুলোর আদব কীভাবে করতে হয়। যদি কেউ বিয়ের কার্ডে আল্লাহ পাক এবং প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক লেখে এবং যাদের ঘরে সেই কার্ড যায় তারা এর আদব না করে, তবে এতে যে লিখেছে সে গুনাহগার হবে না। (দেখুন: মাদানী মুযাকারা, ৩০ সফরুল মোজাফফর ১৪৪২ হি.)

(৮) শয়তানের মৃত্যুর দোয়া করা কেমন?

প্রশ্ন: আমরা কি শয়তানের মৃত্যুর দোয়া করতে পারি?

উত্তর: শয়তানের মৃত্যু তো আসবে, কিন্তু আমাদের দোয়া এবং বদদোয়ার কারণে তার মৃত্যু সম্ভব নয়। কুরআনে পাকে রয়েছে:

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْۤ اِلٰى یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿۳۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবকাশ দাও ঐ-দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।'

(পারা ১৪, সূরা হিজর: ৩৬)

তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যে সময় শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, এই অভিশপ্ত তখন মারা যাবে। সাধারণ জিনদেরও শয়তান বলা হয় এবং তারা মারা যেতে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ১ যিলহজ্জুল হারাম ১৪৪১ হি.)



হযরত আমর বিন হুরাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

মাওলানা ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী মাদানী

অল্প বয়সে যেসব সৌভাগ্যবান শিশু আল্লাহ পাকের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আমর বিন হুরাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও অন্তর্ভুক্ত। আসুন! তাঁর শৈশবের সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়ে নিজেদের অন্তরকে সাহাবায়ে কিরামের ভালোবাসায় আলোকিত করি:

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: তাঁকে অল্পবয়সী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত হুরাইস বিন আমর এবং আমরাহ বিনতে হিশামের পুত্র এবং সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সাঈদ বিন হুরাইসের ভাই। তিনি ২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম কুরাইশি, যিনি কুফায় ঘর বানিয়েছিলেন। (উসদুল গাবাহ, ৪/২২৬। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৬/৫৩৪। ইকমালু তাহযিবিল কামাল, ১০/১৪৯। ফাতহুল বারী, ৬/২১২)

মায়ের সাথে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, আমার মা আমাকে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাকে রিযিকে বরকতের দোয়ার মাধ্যমে ধন্য করলেন। (আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা: ১৭৭, হাদিস: ৬৪৭)

রেওয়ায়েতের সংখ্যা: তাঁর থেকে ৬টি হাদিসে মুবারাকা বর্ণিত আছে।

(ইকমালু তাহযিবিল কামাল, ১০/১৪৮)

কালো পাগড়ি পরিহিত দেখেন: এক বর্ণনায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, নিঃসন্দেহে সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বরের উপর কালো পাগড়ি বেঁধে তাশরিফ এনেছেন এবং পাগড়ির উভয় প্রান্ত (শিমলা) তাঁর কাঁধের মাঝখানে ঝুলে ছিল। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৫৪৪, হাদিস: ৩৩১২। মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/২৭২, হাদিস: ১৪১০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এই হাদিস থেকে

কয়েকটি মাসয়ালা জানা গেল: (১) কালো পাগড়িও সুন্নাত, (২) শিমলা ছাড়া পাগড়ি সুন্নাতের পরিপন্থী, শিমলা অবশ্যই থাকতে হবে, (৩) পাগড়ির দুটি শিমলা হওয়া উত্তম এবং উভয়টি পিঠের উপর থাকবে। হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ি ছিল সাত হাত এবং শিমলা এক বিঘত থেকে কিছুটা বেশি।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৪৪)

ওফাত: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৮ বছর বয়সের ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৮৫ হিজরিতে মক্কা মোকাররমায় ইন্তিকাল করেন।

(ইকমালু তাহযিবিল কামাল, ১০/১৪৮-১৪৯)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যবস্থাপনা

মাওলানা ফরমান আলী আত্তারী মাদানী

দ্বীন ইসলাম উত্তম জীবনযাপনের এমন সব অমূল্য নীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছে, যার উপর আমল করলে একজন মুসলমান কেবল ইসলামী হুকুম-আহকামের অনুসারী হয়ে পরকালে সফল হয় তা নয়, বরং সে পার্থিব জীবনেও এই শিক্ষাগুলোর উপর আমল করে সমাজের একজন সম্মানিত ও সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বীন ইসলাম মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর ও উত্তমভাবে বজায় রাখার জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা জানব যে, ভ্রাতৃত্ব কী, এটি কেন জরুরি এবং সমাজের উপর এর কী কী ফলাফল প্রভাব ফেলে।

ভ্রাতৃত্ব কী? ভ্রাতৃত্বকে আরবিতে "اُخُوَّۃ" বলা হয়, এর অর্থ হলো ভাই হওয়া, ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক, ভাই ভাই ভাব ইত্যাদি। ভ্রাতৃত্ব শব্দটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ভালোবাসা, বিশ্বাস, শুভাকাঙ্ক্ষা এবং নৈকট্যের উপর ভিত্তি করে হয়। ভ্রাতৃত্ব দুই ধরনের হয়ে থাকে; একটি হলো বংশগত এবং অন্যটি দ্বীনি ও ইসলামী। বংশগত ভ্রাতৃত্ব হলো আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের কারণে কিছু মানুষ একে অপরের ভাই হয়। আর দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব হলো ইসলামের ভিত্তিতে এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। এটি এমন এক সুন্দর সম্পর্ক যেখানে মানুষ বর্ণ, গোত্র, জাতি এবং ভাষার পরিবর্তে কেবল ঈমান ও ইসলামের ভিত্তিতে একে অপরের ভাই সাব্যস্ত হয়।

হযরত ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সম্পর্কে বলেন: ভ্রাতৃত্ব দুজন মানুষের মধ্যে একটি সংযোগের মতো, যেমন; বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি সংযোগের নাম। আর যেভাবে বিবাহ বন্ধন কিছু অধিকার দাবি করে, যা পালন করা বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অবস্থাও তেমনই। তোমার ইসলামী ভাইয়ের তোমার সম্পদ এবং তোমার সত্তায় অধিকার রয়েছে; একইভাবে মুখ ও অন্তরেও (অধিকার রয়েছে) যে, তুমি তাকে ক্ষমা করবে, তার জন্য দোয়া করবে, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আচরণ করবে, তার সাথে নম্রতা দেখাবে এবং কষ্ট ও লৌকিকতা পরিহার করবে।

(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ২/২১৬)

কুরআন পাকে ভ্রাতৃত্বের ধারণা: দ্বীন ইসলামে ভ্রাতৃত্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কুরআন ও হাদিসে বহু স্থানে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে এবং মতভেদ দূর করে পরস্পর ঐক্য ও সংহতির সাথে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো সবাই মিলে আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। (পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

এবং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুসলমান মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। (পারা: ২৬, সূরা হুজুরাত: ১০) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: মুসলমানরা তো পরস্পর ভাই ভাই-ই, কেননা তারা পরস্পর দ্বীনি সম্পর্ক এবং ইসলামী ভালোবাসার সাথে যুক্ত আর এই সম্পর্ক সমস্ত পার্থিব সম্পর্কের চেয়ে শক্তিশালী।

(সীরাতুল জিনান, ৯/৪২২)

হাদিস শরীফ এবং ভ্রাতৃত্ব: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য ইমারতের (ভবনের) মতো, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা ১০৭০, হাদিস: ৬৫৮৫) আরও একটি বর্ণনায় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের অধিকারগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন যে, মুসলমান মুসলমানের ভাই; সে না তার উপর অত্যাচার করে, না তাকে লাঞ্ছিত করে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ পাক তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান থেকে বিপদ দূর করে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোনো বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারি, ২/১২৬, হাদিস: ২৪৪২)

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দু'বার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন: সীরাত ও মাগাজি রচয়িতাগণ উল্লেখ করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে দুইবার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমবার বিশেষভাবে মুহাজিরদের মধ্যে হিজরতের আগে হয়েছিল। এটি ছিল একে অপরকে সাহায্য করা এবং দ্বীনের হক আদায়ের উপর। আর দ্বিতীয়বার যখন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরিফ আনলেন, তখন তিনি মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। (উমদাতুল কারী, ৮/১৮২, ১৯৬৮নং হাদিসের পাদটিকা)

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব: মুহাজিররা নিজেদের মাতৃভূমি এবং পরিবার-পরিজন ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন। তাই নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, যাতে মুহাজিররা দারিদ্র্যতা এবং পরিবার-পরিজনের বিচ্ছেদ অনুভব না করে এবং একে অপরের সাহায্য পেতে পারে। মুহাজিরদের

সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় দল থেকে দুজন দুজন ব্যক্তিকে ডেকে বললেন যে, এই ব্যক্তি এবং তুমি ভাই ভাই। তাঁর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ভাই ভাই হয়ে গেলেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ কুরাইশি জুহরি এবং হযরত সা'দ ইবনে রবি আনসারি খাযরাজির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তখন হযরত সা'দ হযরত আব্দুর রহমানকে বললেন যে, আনসারদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি সম্পদ আছে। আমি আমার সম্পদ আপনার সাথে ভাগ করে দিচ্ছি। আমার দু'জন স্ত্রী আছে, তাঁদের মধ্য থেকে আপনি যাকে পছন্দ করেন আমি তাকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন যে, আপনার পরিবার ও সম্পদ আপনার জন্য মোবারক হোক, আমাকে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দিন। তিনি প্রতিদিন বাজারে ব্যবসা করতে লাগলেন, এমনকি কিছু দিনের মধ্যেই ধনী হয়ে গেলেন। (সীরাতে রাসূলে আরবি, পৃষ্ঠা: ১১৯)

নিশ্চয়ই! ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ইসলামের ইতিহাসের একটি মহান ঘটনা যা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য কেবল সাময়িক প্রয়োজন পূরণ করা ছিল না, বরং একটি টেকসই ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল। আসুন! প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি:

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের উদ্দেশ্যসমূহ: ইসলাম এমন একটি দ্বীন যা মানবতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহানুভূতির শিক্ষা দেয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন হিজরত করে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফে তাশরিফ আনলেন, তখন মুসলমানদের একটি বড় অংশ গৃহহীন, সম্পদহীন এবং নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এর পুনর্বাসনের জন্য নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভ্রাতৃত্বের এক চমৎকার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা থেকে ইসলামী, সামাজিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপকারিতা ও সুফল অর্জিত হয়েছিল। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ব্যবস্থার মাধ্যমে কেবল মুহাজিরদের সাময়িক সাহায্যই হয়নি, বরং একটি সামাজিক বিপ্লবও সৃষ্টি হয়েছিল।

(১) সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করা: ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সংহতি স্থাপন করা। যেহেতু মুহাজিররা মক্কা থেকে এসেছিলেন এবং আনসাররা মদীনায় থাকতেন, তাই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের মাঝখানের ব্যবধান দূর করে তাঁদের একে অপরের ভাই বানিয়ে দিলেন। এই বন্ধন কোনো আনুষ্ঠানিক ভ্রাতৃত্ব ছিল না, বরং তাঁরা বাস্তব জীবনেও একে অপরের সুখে-দুখে, হাসি-কান্নায় অংশীদার হতে লাগলেন। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে বর্ণগত, ভাষাগত এবং গোত্রীয় বৈষম্যের অবসান ঘটল এবং ইসলামী সমাজে ঐক্য, সংহতি ও সমমর্মিতার পরিবেশ স্থাপিত হলো।

(২) অভাবীদের সাহায্য এবং সমতা স্থাপন করা: ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সমতা স্থাপন করা। মুহাজিররা তাঁদের সমস্ত সম্পদ মক্কায় রেখে এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সহায়-সম্বলহীন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারদের তাঁদের ভাই বানিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন নিজেদের ধন-সম্পদে মুহাজিরদের অংশীদার করেন। আনসাররা এই নির্দেশের উপর আন্তরিকভাবে আমল করলেন। কেউ কেউ নিজেদের অর্ধেক বাগান, এমনকি ঘর পর্যন্ত দিয়ে দিলেন যাতে মুহাজিরদের প্রয়োজন পূরণ হয়। এই কাজের মাধ্যমে কেবল দরিদ্র্যতাই দূর হলো না, বরং সমতার ভিত্তিতে এক আদর্শ সমাজ স্থাপিত হলো।

(৩) ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের প্রসার: যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে নিজের ভাই মনে করে, তখন তার প্রতি হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা এবং স্বার্থপরতার মতো দোষগুলো গ্রহণ করে না। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রাতৃত্বের ব্যবস্থা স্থাপনের পর আনসাররা কোনো প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ না করে, আন্তরিকভাবে মুহাজিরদের সাহায্য করলেন, যার ফলে তাঁদের অন্তরে একে অপরের জন্য নৈকট্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। এই ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব ক্ষণস্থায়ী ছিল না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে টিকে থাকার ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এমন একটি মহান কাজ ছিল, যা ইসলামী সমাজের ভিত্তি ন্যায়বিচার, সমতা, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের উপর রেখেছিল। এর মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যতক্ষণ আমরা একে অপরের দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হব না, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ উম্মত হতে পারব না। আজও যদি আমরা ভ্রাতৃত্বের এই মহান চেতনাকে ধারণ করি, তবে আমাদের সমাজ থেকে দরিদ্র্যতা, ঘৃণা ও বৈষম্যের অবসান হতে পারে এবং আমরা একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

ইসলাম আমাদের ইবাদতের পাশাপাশি একটি আদর্শ সমাজ গড়ারও শিক্ষা দেয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এমন এক নেয়ামত, যা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় পর্যায়ে আনন্দদায়ক প্রভাব ফেলে। আসুন! ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কয়েকটি উপকারিতা লক্ষ্য করি:

১. ভালোবাসা সৃষ্টি হয়: ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে একে অপরের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। হাদিস শরীফে রয়েছে যে, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৫১, হাদিস: ১৯৪)

২. সামাজিক সংহতি: ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ঐক্য, একতা ও সংহতি সৃষ্টি হয়, যা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের ভিত্তি। আপনি মোটা মোটা দড়ি দেখেছেন যা সরু ও দুর্বল সুতোর সমন্বয়ের ফল। একটি আলাদা সুতো এত দুর্বল হয় যে, ছোট শিশুও তা সহজেই ছিঁড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু যখন অনেক দুর্বল সুতো একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন একটি শক্তিশালী দড়ির রূপ নেয়, যা বড় বড়

জাহাজকেও পানির তীব্র স্রোতে আটকে রাখতে পারে।

৩. সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব: ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে অন্যের সাহায্য ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয়। এক মুসলমান ভাই কোনো সমস্যায় পড়লে তার অন্য ইসলামী ভাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করে এবং এতে আল্লাহ পাকের সাহায্য অন্তর্ভুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে লেগে থাকে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা ১১১০, হাদিস: ৬৮৫৩)

৪. ঘৃণা ও শত্রুতার অবসান: ভ্রাতৃত্বের বরকতে যেসব জিনিসের কারণে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়, যেমন; হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত ইত্যাদি দোষের অবসান ঘটে এবং ঘৃণা দূর হয়। নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, পেছনে একে অপরের দোষ বর্ণনা করো না এবং হে আল্লাহর বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে যাও।

(বুখারি, ৪/১১৭, হাদিস: ৬০৬৬)

৫. আল্লাহর ভালোবাসা ও রহমতের মাধ্যম: ভ্রাতৃত্ব স্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর বিশেষ রহমত অবতীর্ণের অধিকার অর্জিত হয়। নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার ভালোবাসা সেসব লোকের জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, একে অপরের জন্য খরচ করে এবং একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে।

(মুসনাদে আহমদ, ৮/৪২১, হাদিস: ২২৮৪৭)

৬. আখিরাতে মর্যাদা উন্নত হবে: কিয়ামতের দিন সেসব লোক যারা ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে জীবন অতিবাহিত করবে, তাদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে। হাদিস শরীফে রয়েছে: আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: আমার মাহাত্ম্যের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসা লালন কারীরা আজ কোথায়? আমি তাদের আমার ছায়ায় স্থান দেব, কারণ আজ আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১০৬৫, হাদিস: ৬৫৪৮)

৭. সম্পদের ভালোবাসার জায়গায় ত্যাগের নেয়ামত পাওয়া যায়: ভ্রাতৃত্বের বরকতে অন্তর থেকে সম্পদের ভালোবাসা দূর হয়ে যায় এবং তার জায়গায় ত্যাগের মহান সম্পদ নসিব হয়। এটি কেবল একটি সামাজিক সম্পর্ক নয়, বরং ঈমানের ভিত্তিতে স্থাপিত এমন এক সম্পর্ক যা মানুষকে নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সাহস দেয়। এই চেতনাই একটি আদর্শ, পারস্পরিক সহানুভূতি ও ত্যাগের উপর ভিত্তি করে সমাজ গঠন করে, যেখানে ব্যক্তিরা স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে অন্যের খুশিকে নিজের খুশি মনে করে।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার পুরস্কার (ঘটনা): প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য অন্য জনপদে গেল। আল্লাহ পাক তার পথে একজন ফেরেশতা পাঠালেন যিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? সে উত্তর দিল: ওই জনপদে আমার এক ভাই আছে, তার সাথে

দেখা করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন: তোমার উপর কি তার কোনো উপকার রয়েছে, যা আদায় করতে চাও? সে বলল: এ ছাড়া আর কোনো বিষয় নেই যে, আমি আল্লাহর জন্য তাকে ভালোবাসি। ফেরেশতা বললেন: আমি তোমার কাছে আল্লাহর এই বার্তা নিয়ে এসেছি যে, যেভাবে তুমি তাকে ভালোবাসো, আল্লাহ পাকও তোমাকে ভালোবাসেন।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৬৫, হাদিস: ৬৫৪৯)

আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত: সুফিদের একটি দলকে জনৈক খলিফার সামনে উপস্থাপন করা হলো এবং তিনি তাদের শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুসাইন আহমদ বিন মুহাম্মদ নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জল্লাদের দিকে এগিয়ে গেলেন যাতে সবার আগে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন: "আমি পছন্দ করি যে, এই মুহূর্তে আমার ভাইদের জীবনকে নিজের উপর প্রাধান্য দেব।" তাঁর এই কথা সবার মুক্তির কারণ হয়ে গেল।

(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ২/২১৬)

ছাগলের মাথা সাত ঘরের মেহমান: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের মধ্য কাউকে একটি ছাগলের মাথা উপহার দেওয়া হলো। তিনি এই বলে "আমার অমুক ভাই আমার চেয়ে এর বেশি প্রয়োজনগ্রস্ত," মাথাটি তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও একই চিন্তা করে আরেকজনকে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে ওই মাথা এক থেকে অন্য জনের কাছে পাঠানো হতে লাগল, এমনকি সাত হাত ঘুরে আবার প্রথম সাহাবীর কাছে ফিরে এলো। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ২/২১৭)

বর্তমান যুগে ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে "ভ্রাতৃত্ব" স্থাপন করেছিলেন, তা ইসলামী সামাজিকতার এক মহান উদাহরণ। এই ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য কেবল মুহাজিরদের বাসস্থান বা তাঁদের আর্থিক সাহায্য ছিল না, বরং পরস্পরের অন্তরকে জুড়ে দেওয়া এবং একে অপরের সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী বানানোই ছিল। কিন্তু আফসোস! অথচ আজ আমরা এই মহান সুন্নাতকে ভুলে গেছি।

বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা এমন যে, ঘরে ঘরে ঝগড়া, ভাই ভাইয়ের উপর অসন্তুষ্ট এবং আত্মীয়-স্বজন একে অপরের চেহারা দেখা পর্যন্ত পছন্দ করে না। সামান্য কথায় বছরের পর বছরের পুরনো বন্ধুত্ব ভেঙে যায়। একই প্রতিষ্ঠানে, বিভাগে বা ঘরে থেকেও আমরা একে অপরের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি রাখি না। আমাদের অন্তর বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণায় ভরা। আমরা অন্যদের কাছে দয়া, সম্মান ও স্নেহের প্রত্যাশা করি কিন্তু নিজেরা ছোটখাটো মনোমালিন্যে সম্পর্ক শেষ করে দিই। এ কারণেই মুসলমানরা আজ দুর্বল, বিচ্ছিন্ন এবং অন্যদের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার। যদি আমরা ভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটাতাম, একে অপরের মঙ্গল কামনা করতাম এবং স্বার্থপরতা ছেড়ে আন্তরিকভাবে

ভালোবাসতাম, তবে হয়তো আমাদের অবস্থা ভিন্ন হতো। আফসোস যে, আজ ভালোবাসাও স্বার্থের সাথে শর্তযুক্ত হয়ে গেছে।

নিচে এমনই কিছু ইসলামী নীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে, যা কেবল মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে না, বরং ভ্রাতৃত্বকেও প্রসারিত করে যা একটি শক্তিশালী উম্মতের ভিত্তি।

(১) সালামের প্রসার ঘটানো: ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বাড়ানোর একটি উপায় হলো একে অপরকে বেশি বেশি সালাম দেওয়া, আমরা তাকে চিনি বা না চিনি। হাদিস শরীফে রয়েছে: তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ঈমান আনো, আর তোমরা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসো। আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বলে দেব না, যা যদি তোমরা করো তবে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (তা হলো) সালামের প্রসার ঘটানো।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৫১, হাদিস: ১৯৪)

(২) পরস্পর উপহার দেওয়া: ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার প্রসার ঘটাতে উপহার আদান-প্রদান করুন, কারণ এতে অন্তর পরিষ্কার হয়। হাদিস শরীফে রয়েছে: تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ পরস্পর উপহার দাও, ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২/৪০৭, নাম্বার: ১৭৩১)

(৩) মুসলমানদের অজুহাত গ্রহণ করা: যদি কোনো মুসলমান ভাই ভুল করে এবং তারপর সেই ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চায়, তবে তার অজুহাত গ্রহণ করা উচিত। কারণ এতে অন্তরের মালিন্য দূর হয়।

(৪) উত্তম আচরণ করা: সদাচরণ এবং নম্র স্বভাবও ভালোবাসা বাড়ানো এবং সামনের জনের মন জয় করার কারণ এবং একজন ভালো মানুষের লক্ষণ। হাদিস শরীফে রয়েছে: তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে, যে আচরণে সবচেয়ে উত্তম।

(বুখারি, ২/৪৮৯, হাদিস: ৩৫৫৯)

(৫) সুখে-দুখে অংশীদার হওয়া: কোনো রোগীর সেবা করা বা নিজের মুসলমান ভাইয়ের সুখে-দুখে তার অংশীদার হওয়াও ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধির একটি কারণ। হাদিস শরীফে রয়েছে: মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইয়ের সেবা করতে (দেখতে) যায়, তখন ফিরে আসা পর্যন্ত সর্বদা জান্নাতের ফল কুড়াতে থাকে। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৬৬, হাদিস: ৬৫৫৪)। যে কোনো বিপদগ্রস্তকে সমবেদনা জানাল, সে বিপদগ্রস্তের সমান সাওয়াব পাবে। (তিরমিযী, ২/৩৩৮, হাদিস: ১০৭৫)

(৬) আন্তরিকভাবে শুভাকাঙ্ক্ষা করা: নিজের মুসলমান ভাইয়ের ভালো চাওয়া, কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত দেখে তাকে সংশোধন করা এবং তাকে ভালো পরামর্শ দেওয়া হলো শুভাকাঙ্ক্ষা, যা অন্তরে একে অপরের জন্য বিশ্বাস ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

(৭) উৎসাহিত করা: নিজের ভাইয়ের কোনো ভালো কাজ বা তার যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রশংসা করা এবং উৎসাহিত করাও পারস্পরিক ভালোবাসা বাড়ানোর একটি উপায়।

আল্লাহ পাক যেন আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সাথে থাকার এবং একে অপরের কঠিন সময়ে সাহায্য করার তৌফিক দান করুক, আমিন।

আপন বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

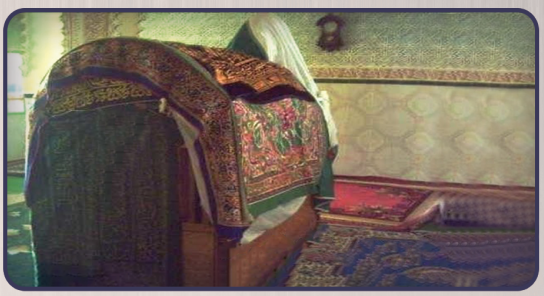





রজবুল মুরাজ্জাব ইসলামী বছরের সপ্তম মাস। এই মাসে যেসব মহান ওলি-আউলিয়া এবং ইসলামী স্কলারদের ওফাত দিবস বা ওরস রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১১৬ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" রজবুল মুরাজ্জাব ১৪৩৮ থেকে ১৪৪৬ হিজরির সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে। আরও ৬ জনের পরিচিতি নিচে দেওয়া হলো:

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:

(১) শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ বিন ইয়াখলাফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৭৫৬ হিজরির জুমাদিউল উখরা মাসে আর-রাশিদিয়া, মেকনেস তাফি লালিত অঞ্চল, প্রাচ্যে (মরক্কো) হয় এবং ২৪ রজব ৮৫৭ হিজরিতে ওয়ালাহাসা, আইন তিমুশানত প্রদেশ, আলজেরিয়া, আফ্রিকায় ওফাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন আল্লামা ও ফাযিল, জাহিদ ও মুত্তাকি, বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী, মুদাররিস ও মুফতি, আল্লামাতুল মুহাক্কিকীন, মুসনাদুল আসর, সদরুল আফাযিল এবং কারামতসম্পন্ন আল্লাহর ওলী। (ওয়েবসাইট: মুদাওয়ানাতু বুরুজ বিন আযুয, তারজামাতুল ওয়ালিয়্যিস সালিহ সায়্যিদি মুহাম্মদ বিন ইয়াখলাফ: albordj.blogspot.com)

(২) মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ফারুকি মুহিব্বুল্লাহি ইলাহাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম মহল্লা বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ, ইউপি ভারতের এক ইলমি ও রুহানি ফারুকি পরিবারে আনুমানিক ১২৬৯ হিজরিতে হয় এবং ওফাত ৮ রজব ১৩২২ হিজরিতে আজমের শরীফের গরিবে নেওয়াজের দরবারে হয়, সেখানেই দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন কুদওয়াতুল মুহাক্কিকীন, উমদাতুল মুদাক্কিকীন, ফাযিলে কবির, আলিম ও সাহিত্যিক, দক্ষ হেকিম, আরিফ বিল্লাহ, ইমামুল ওলামা, রঈসুল আসফিয়া, বহু কিতাবের লেখক, জ্ঞান ও আমলের উৎকর্ষতা সম্পন্ন, সাহিবে হাল

সুফি, শহীদে মুহব্বত এবং উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষার শক্তিশালী কবি।

(তাযকিরায়ে গাউসে সামদানী, পৃষ্ঠা: ১৩-২৭)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:

(৩) শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইসমাঈল বিন ইবরাহীম হাশেমী জাবারতি জাবিদি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৭২২ হিজরিতে এবং ওফাত ১৫ রজব ৮০৬ হিজরিতে হয়। তিনি ছিলেন যাবিদ ইয়েমেনের আলিম, মুহাদ্দিস, ওয়ায়েয, ইবাদতগুজার, আল্লাহর ওলী, কারামতসম্পন্ন, আল্লামা ইবনে আরাবি ও ফুসুসুল হিকাম এর প্রেমিক, সাধারণ জনগণ ও শাসকদের কাছে মকবুল, প্রচুর ফয়েয প্রদানকারী, পবিত্র সুফি এবং অধিক পরিমাণে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াতকারী। (আদ দাউউল লামি, ২/২৮২-২৮৪)

(৪) ইমাম মুহাম্মদ মাহফুয তারমাসি জাভি শাফেয়ী মুহাজির মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২৮৫ হিজরিতে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভার কাচিতান জেলার আরজুসারি উপজেলার তারমাস গ্রামে হয় এবং ১লা রজব ১৩৩৮ হিজরিতে মক্কা মুকাররমায় ওফাত লাভ করেন, জান্নাতুল মা'লা কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন হাফেয ও কারী, ফকিহ ও মুহাদ্দিস, মুসনাদুল আসর, লেখক, মসজিদুল হারামের উস্তাদ, মুত্তাকি ও পরহেযগার, বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী, উত্তম চরিত্রের প্রতীক এবং বহু ছাত্রের শিক্ষক। প্রায় দুই ডজন কিতাবের মধ্যে হাশিয়াতুত তারমিসী, গুনিয়াতুত তালাবা, বাগিয়াতুল আযকিয়া এবং নাইলুল মামুল উল্লেখযোগ্য।

(ইমতাউল ফুযালা বিতারাযিমিল কুররা, ২/৩৫৪-৩৫৭)

(৫) শায়খ সৈয়দ ফযল পাশা বিন আলবি মালিবাবি মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২৪০ হিজরিতে দক্ষিণ ভারতের কেরালার মালিবার, কালিকট এর ইলমি সৈয়দ বা আলভী পরিবারে হয় এবং ২ রজব ১৩১৮ হিজরিতে ইস্তাম্বুলে ইন্তেকাল করেন। দাফন করা হয় ইস্তাম্বুল, তুরস্কের মাযার কমপ্লেক্সে। তিনি ভারতের আলিম, ইয়েমেন ও মক্কার আলিমদের থেকে উপকৃত, দ্বীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞানে সমৃদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, লেখক, দক্ষিণ ওমানের জাফার এর গভর্নর, উসমানি সাম্রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিশেষ ও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তাঁর ২০টি কিতাবের মধ্যে উকুদুল ফারায়েদ এবং ইযাহুল আসরারিল আলাভিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

(উকুদুল ফারায়েদ, পৃষ্ঠা: ৫, ৬)

(৬) বদরুল মিল্লাত ও দ্বীন শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম গালায়িনি জিলানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৩৩০ হিজরিতে দামেস্কের আকাবা এর নিকটস্ত সামানাহ মহল্লায় হয় এবং ২৩ রজব ১৪১১ হিজরিতে জেদ্দায় ওফাত লাভ করেন, মা'লা কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি শাফেয়ী ও হানাফি ফিকহে পারদর্শী, মুসনাদুল আসর এবং মুদাররিস ও মুফতি ছিলেন। মাওলানা যিয়াউদ্দিন মাদানী থেকেও ইজাযত ও খেলাফত লাভ করেছিলেন। জর্ডান ও দামেস্কে শিক্ষকতা ও ইমামতি করেছেন এবং যুহুদ ও দানশীলতায় বিখ্যাত ছিলেন। (ইতহাফুল আকাবির, পৃষ্ঠা: ৫৪৯। তাযকিরায়ে ওলামায়ে আরব, ১/৪৯০-৪৯৩)

শাবানুল মুয়াযযম ইসলামী বছরের অষ্টম মাস। এই মাসে যেসব সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজাম এবং ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা ওরস রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১১১ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" শাবানুল মুয়াযযম ১৪৩৮ থেকে ১৪৪৬ হিজরির সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে। আরও ৬ জনের পরিচিতি নিচে দেওয়া হলো:

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

(১) হযরত বাশির বিন আনবাস বিন যায়েদ আনসারি জাফরি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ছিলেন একজন সাহসী সাহাবী। তাঁর উপাধি ছিল ফারিসুল হাওয়া (অর্থাৎ হাওয়া ঘোড়ার অশ্বারোহী)। তিনি উহুদ যুদ্ধের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ এবং পরবর্তী সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জিসর যুদ্ধে (শাবান ১৩ হিজরি) শাহাদাতবরণ করেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত কাতাদা বিন নোমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। (আল আসাবাহ, ১/৪৪৩। উসদুল গাবাহ, ১/২৯৪)

(২) হযরত সাবিত বিন আতিক আনসারি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বনি আমর বিন মাবযুল গোত্রের ছিলেন। তাঁর শাহাদাত জিসর যুদ্ধে (শাবান ১৩ হিজরি বা ১৫ হিজরি) হয়।

(আল আসাবাহ, ১/৫০৯। আসাদুল গাবাতি, ১/৩৩৭)

আউলিয়ায়ে কিরাম ও ওলামায়ে ইসলাম

رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن:

(৩) বাহরুল উলুমের ছাত্র আল্লামা আহমদ আনওয়ারুল হক ফারাঙ্গি মহাল্লি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ছিলেন কাদেরিয়া রাযযাকিয়া সিলসিলার শায়খে তরীকত, কামেল সুফি এবং যিকির-আযকারে লিপ্ত বুযুর্গ। তাঁর ওফাত ৬ বা ২৬ শাবান ১২৩৬ হিজরি মোতাবেক ১৮২১ ইংরেজিতে হয়। লক্ষ্ণৌতে নিজের বাগানে দাফন করা হয়। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খানের প্রপিতামহ হাফেয শাহ কাযিম আলী খান তাঁর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। (মুমতায ওলামায়ে ফারাঙ্গি মহাল্লি, পৃষ্ঠা ১১১-১১৫। তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত, পৃষ্ঠা:৩২। তাযকিরায়ে ওলামায়ে হিন্দ, পৃষ্ঠা: ৯৪)

(৪) পীরে তরিকত হযরত খাজা সৈয়দ গুলাব শাহ আওরঙ্গাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২৬৪ হিজরিতে হয় এবং ওফাত ১৩ শাবান ১৩৫৫ হিজরিতে লাভ করেন। মাযার আটক জেলার জান্ড উপজেলার আওরঙ্গাবাদ গ্রামে অবস্থিত। তিনি ছিলেন আলিম, মুদাররিস, উস্তাদুল ওলামা, খাজা শামসুল আরেফিনের মুরিদ ও খলিফা এবং কারামতসম্পন্ন বুযুর্গ। সারা জীবন শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেছেন। কাবুল, কান্দাহার, গযনী, ছুহ এবং হাজারা থেকে ছাত্ররা এসে পড়ত।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত জেলা আটক, পৃষ্ঠা: ১১১-১১৩)

(৫) পীরে তরীকত ডাক্তার মুহাম্মদ আল্লাহ দিত্তাহ তালিব কুঞ্জাহি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ ইংরেজিতে গুজরাট জেলার কুঞ্জাহতে হয় এবং ওফাত ১১ শাবান ১৩৭৭ হিজরিতে হয়, জন্মস্থানেই দাফন করা হয়।

প্রাথমিক জীবনে তিনি সেনাবাহিনীতে সহকারী সার্জন পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে আমিরে মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ জামায়াত আলী শাহ মুহাদ্দিস আলিপুরী থেকে বাইয়াত ও খেলাফতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী, আশিকে রাসূল, লেখক এবং ইসলামী কবি।

(তাযকিরায়ে খুলাফায়ে আমিরে মিল্লাত, পৃষ্ঠা: ২১২-২১৫)

(৬) শামসুল আইম্মা ইমাম বকর বিন মুহাম্মদ আনসারি বুখারি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ছিলেন শায়খুল হানাফিয়া, বুখারার মুফতি, ছোট আবু হানিফা এবং হানাফি মাযহাবের হাফেয। তাঁর জন্ম ৪২৭ হিজরিতে বুখারার নিকটস্ত জারাঞ্জারিতে হয়। শামসুল আইম্মা আব্দুল আযিয হালওয়াই এবং অন্যান্য ওলামা ও মাশায়েখ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। হেদায়া প্রণেতা শায়খ আলী বিন আবু বকর ফারগানি তাঁরই ছাত্র। তিনি ১৯ শাবান ৫১২ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪/৩৭৫)



মেয়েদের মেহমানদারির আদব শেখান

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মেহমানদারিকে একটি মহান গুণ ও নেকী হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত মেহমানের সম্মান করা। (বুখারি, ৪/১০৫, হাদিস: ৬০১৯) এই শিক্ষা কেবল পুরুষদের জন্য নয় বরং নারীদের, বিশেষ করে মেয়েদের জন্যও, কারণ তারাই ভবিষ্যতের মা, শিক্ষিকা এবং সমাজের স্তম্ভ হয়ে ওঠে। মেহমানদারি কেবল খাবার বা চা পরিবেশন করার নাম নয়, বরং এটি একটি নৈতিক গুণ, দ্বীনি প্রশিক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য; এটি হৃদয়ের প্রশস্ততা, উত্তম চরিত্র এবং অন্যদের প্রতি সম্মানের বহিঃপ্রকাশ।

তাই জরুরি হলো; আমরা যেন আমাদের মেয়েদের অন্তরে মেহমানদারির আগ্রহ সৃষ্টি করি। তারা যেন সদাচরণের সাথে উপস্থিত হয়, মুচকি হেসে সালাম দেয়, আদবের সাথে কথা বলে এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মেহমানের খেদমতে লেগে যায়।

নিজের কর্ম দ্বারা শেখান: যখন ঘরে মেহমান আসে, মা ও বাবা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন, যাতে মেয়ে দেখে শিখতে পারে। মা-বাবার উচিত মেয়েদের ব্যবহারিকভাবে মেহমানদারিতে অংশীদার করা, কারো জন্য চা বানানো হোক, দস্তরখান বিছানো হোক বা হাসিমুখে পানি পরিবেশন করা হোক। মেহমানের ছোটখাটো কাজের দায়িত্ব দিন যাতে সে খেদমতের আগ্রহ অনুভব করতে পারে। মনে রাখবেন, মেয়েদের দিয়ে কেবল মহিলা এবং মুহরিমদের মেহমানদারি করানো উচিত। মেহমান নামুহরিম হলে মেহমানদের জন্য চা এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করান এবং নামুহরিম মেহমানের সামনে যাওয়া থেকে বিরত রাখুন। যখন মেয়ে মেহমানদারি শেখে, তখন সে আসলে ভালোবাসা বিলিয়ে দেওয়ার কৌশল শেখে। এই

গুণটি পরবর্তী সময়ে তার বৈবাহিক জীবনেও বরকতের উপলক্ষ্য হয়, কেননা যে মেয়ে নিজের ঘরে মেহমানদের সেবা করতে জানে, সে আগামীকাল নিজের শ্বশুরবাড়িতেও সম্মান ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। যখন মেয়ে মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তার প্রশংসা করুন, যাতে সে এই কাজটিকে পছন্দ করে এবং এটি পুনরায় করতে চায়।

মেহমানদারি এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ: মেয়েদের এটা বোঝানো জরুরি যে, মেহমানদারি কেবল পার্থিব লাভ নয় বরং পরকালেও প্রতিদানের মাধ্যম। হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে اَبُو الضِّيفان (অর্থাৎ অতি মেহমানপরায়ণ) বলা হয়। হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি খুব মেহমানপরায়ণ ছিলেন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, তিনি একা খাবার খেতেন না; মেহমান এলে তাঁর সাথে বসেই খাবার খেতেন। যদি কখনো মেহমান না আসত, তবে নিজে বাইরে গিয়ে কাউকে খুঁজতেন, মেহমানকে সাথে আনতেন এবং তার সাথে বসে খাবার খেতেন। মেহমানদারিকে আকর্ষণীয় করে তুলুন। যখন মেয়েদের মধ্যে মেহমানদারির আগ্রহ তৈরি হয়, তখন তারা কেবল ঘরে নয় বরং সমাজেও ভালোবাসা, সম্মান এবং সদাচরণের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। এমন মেয়েদের পরিবারই ভবিষ্যতে উত্তম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রমাণিত হয়, যারা নিজেদের সন্তান ও অধীনস্থ মেয়েদের এই মূল্যবোধগুলো শেখায়; এভাবে একটি মর্যাদাবান ও সচ্চরিত্রবান প্রজন্ম গড়ে ওঠে। এই আচরণ কেবল ধর্মীয় প্রতিদানের কারণই নয় বরং নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক মর্যাদারও প্রতীক। মনে রাখবেন! মেহমানদারি কেবল একটি কাজ নয়, বরং একটি চরিত্র। মেহমানদারি সম্পর্ককে শক্তিশালী করে, সমাজে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে এবং ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে। মেহমানকে আল্লাহর রহমত মনে করে তাদের স্বাগত জানান।

মেহমানদারিকে ফযিলত মনে করুন: মেহমানদারিকে সৌভাগ্য ও ফযিলত মনে করুন, বোঝা নয়। নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কোনো মেহমান কারো কাছে আসে, তখন সে নিজের রিযিক নিয়ে আসে এবং যখন সেখান থেকে যায়, তখন বাড়ির মালিকের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার উপলক্ষ্য হয়। (কাশফুল খিফা, ২/৩৩, হাদিস: ১৬৪১) ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানদারি করা ইসলামের আদব এবং নবী ও নেককারদের সুন্নাত। (শরহুন নববী আলাল মুসলিম, ২/১৮)

মেহমানদারির প্রস্তুতি নিন: ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন, যাতে মেহমান আসলে আপনার কোনো দুশ্চিন্তা না হয়। একজন মেহমানপরায়ণ মেজবান হওয়ার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি জরুরি।

আন্তরিকতা প্রকাশ করুন: মেহমানদের সাথে হেসে সাক্ষাৎ করুন, তাদের প্রয়োজনের খেয়াল রাখুন এবং তাদের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। মেহমান আসলে নিজের কাজে ব্যস্ত

থাকার পরিবর্তে তাকে সময় দিন, তার সাথে কথাবার্তা বলুন, এতে বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু মনে রাখবেন, মেহমান হোক বা যেই হোক, মিথ্যা, গীবত এবং গুনাহে ভরা কথাবার্তা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকুন।

মেহমানের সামনে খাবার পরিবেশন করার আদবঃ (১) খাবার উপস্থিত করতে তাড়াহুড়ো করা। (২) খাবারে যদি ফল থাকে তবে প্রথমে ফল পরিবেশন করা, কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ (**Medical Point of View**) থেকে ফল আগে খাওয়া বেশি উপকারী। (৩) বিভিন্ন ধরনের খাবার থাকলে যথাসম্ভব সব খাবার একসাথে পরিবেশন করা। (৪) যতক্ষণ পর্যন্ত মেহমান খাবার থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দস্তরখান উঠিয়ে না নেওয়া। (৫) মেহমানদের সামনে ততটুকু খাবার রাখা, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়, কারণ প্রয়োজনের চেয়ে কম খাবার রাখা সৌজন্যের পরিপন্থী এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রাখা লৌকিকতা ও প্রদর্শনী। **(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ২/২২-২৩)**

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে মেজবানি ও মেহমানদারির আদবগুলোর খেয়াল রাখার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাকতাবাতুল মদীনায়

রজব মাস উপলক্ষ্যে পাওয়া যাচ্ছে

ফয়যানে রজব

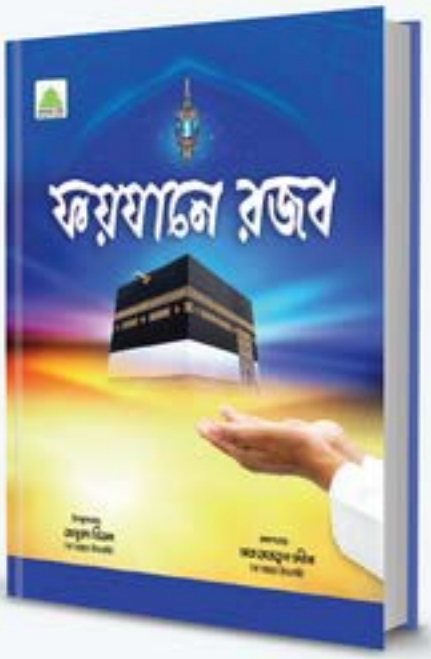

Whatsapp -এ মাকতাবাতুল মদীনার
সকল আপডেটকৃত পোস্ট ও ভিডিও পেতে
QR code স্ক্যান করুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Maktaba Tul Madina Bangladesh

01180742